PANCHAKOTesSAYS
ISSN : 0976-4968
Vol-12, No.-1, May 2021

ধূসর পাণ্ডুলিপি থেকে মহাপৃথিবী- প্রকৃতিপ্রয়াণের পথে একটি বিস্মৃত সোপান: রূপসী বাংলা

শ্রুতি মুখার্জ্জী [1*]

[1*] সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজা বীরেন্দ্র চন্দ্র কলেজ। কান্দি, রাজবাটী, মুর্শিদাবাদ-৭৪২১৩৭। E-mail ID-srutimukherjeetuli@gmail.com

সারসংক্ষেপ

আবহমান বাংলা—বাঙালী-কে উৎসর্গীকৃত রূপসী বাংলা কাব্যের সনেটগুচ্ছ আবহমান বাংলাদেশের মগ্ন, মুগ্ধ রূপভাষ্য। একথা বহুচর্চিত, সংশয়াতীত। জীবনানন্দের সমগ্র কাব্য-পরিক্রমায় প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে প্রেম, সময় এবং মৃত্যু এই তিন মাত্রা মাত্রাহীন বর্ণমালায় উৎকীর্ণ। কিন্তু কবিতার ফুলদানীতে এই মনোবীজরাশির সমসত্ত্ব মিশেল, তার সুবলয়িত প্রকাশ খুঁজে পাওয়া যায় রূপসী বাংলা-য়। মৃত বাংলার প্রকৃতি আর প্রেম হাত ধরাধরি করে কবির জীবনকে ঘের দিয়ে থাকে যেন। রূপকথা-পুরাণগাথা-ইতিহাসমালার আলোভূমি থেকে দেখা রূপসী বাংলার রূপ-কথায় আছে জন্মমৃত্তিকার প্রতি গাঢ় প্রেম। কিন্তু শুধু প্রকৃতিপ্রেম বা জন্মভূমির প্রতি অনিমেষ অনুরক্তিতেই রূপসী বাংলা ফুরিয়ে যায় না। সনেটসমূহের পংক্তিতে পংক্তিতে উপমা-উৎপ্রেক্ষা-সমাসোক্তির বয়নে লীন হয়ে আছে ইন্দ্রিয়ঘন সংরাগ আর আশ্চর্য এক বিভ্রম। প্রকৃতির পথ পরিক্রমায় নিরবধি কাল হয়ে উঠেছে এক চক্রযান। আর কবি যেন যাত্রা করেছেন সময় পরিভ্রমণে।,

সূচক শব্দ: প্রকৃতি, সময়, জীবনানন্দ, মৃত্যু।

ভাষা হল ভাব প্রকাশের মাধ্যম। আবার ভাবকে গোপন করতেও সহস্র এক আড়াল রচনা করে ভাষারই শরীর। চর্যাগীতির কাল থেকেই বাংলা ভাষা তার সাক্ষ্য বহন করছে। *রূপসী বাংলা* কবির মনোভূমির উৎস অন্ধকার পেরিয়ে এলেও তাঁর জীবিতাবস্থায় প্রকাশের আলো দেখেনি। কবির জীবদ্দশায় এই কাব্যের একটি কবিতাও কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। পাণ্ডুলিপিতে কোনো সংশোধন-পরিমার্জনও ঘটেনি। *জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা*-র প্রথম প্রকাশকালে (মে, ১৯৫৪) কবি জীবিত, কিন্তু *রূপসী বাংলা*-র কোনো কবিতা সেখানে স্থান পায়নি। এই নির্বাসনের কারণ যাই হোক, কবির অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের তুলনায় *রূপসী বাংলা*-কে আর একবার ফিরে দেখা যায়।

রূপসী বাংলা-র কবিতাগুলির প্রকৃত রচনাকাল কোন সময়? পাণ্ডুলিপির খাতায় আছে: মার্চ, ১৯৩৪। ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত *রূপসী বাংলা*-র ভূমিকায় কবিভ্রাতা অশোকানন্দ দাশ লিখেছেন—"পঁচিশ বছর আগে খুব পাশাপাশি সময়ের মধ্যে একটি বিশেষ ভাবাবেগে আক্রান্ত হয়ে*রূপসী বাংলা*-র কবিতাগুলি রচিত হয়েছিল। এ-সব কবিতা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'- পর্যায়ের শেষের দিকের ফসল"[১](দাশ, ১৩৭৭: ১৮৬)। সেদিক থেকে *রূপসী বাংলা* হল *ধূসর পাণ্ডুলিপি*-র পিঠোপিঠি বয়সী। আর *বনলতা সেন*-এর কবিতাগুলির রচনাকাল ১৯২৫ থেকে ১৯৩৯। *রূপসী বাংলা*-র স্থানিক পটভূমি বাংলাদেশের পল্লীগ্রাম—"বাংলার যে

মুখ কবি দেখেছেন, তা বরিশালের আঞ্চলিক বাংলা, কিন্তু কবির কল্পনাময় আলেখ্যে তা হয়ে উঠেছে সার্বিক, সামগ্রিক বাংলার আন্তরিক প্রতিচ্ছবি"[২]।

ধূসর পাণ্ডুলিপি, রূপসী বাংলা এবং *বনলতা সেন* এই তিন কাব্যগ্রন্থের কবিতায় অনুষঙ্গের ব্যবহার লক্ষণীয়। শব্দ, বাক্যাংশ, উপমা এবং চিত্রকল্পের পৌনঃপুনিক প্রয়োগ আছে কবিতাগুলিতে। কিন্তু ভাবের এক ধীর বিবর্তন ঘটে গেছে। *রূপসী বাংলা*-য় বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে অন্তঃপ্রকৃতির এক অবিচ্ছিন্ন ঘন সংযোগ রচিত হয়েছে। কবিমানস এখানে শুধু রূপদ্রষ্টা নয়, প্রকৃতিরূপসীর সত্তায় অনুপ্রবিষ্ট। যেন সেই জগতের অন্যতম নাগরিক তিনি। প্রকৃতির সঙ্গে এতখানি আত্তীকরণ কালিদাসের শকুন্তলাকেই মনে পড়ায়। *রূপসী বাংলা*-য় কবি সচেতনভাবেই আত্মবিস্মৃত।

ধূসর পাণ্ডুলিপি থেকে *বনলতা সেন* পেরিয়ে *মহাপৃথিবী*-র পথে যাত্রা করার অন্যতম সোপান হল *রূপসী বাংলা*। সমসাময়িক কবি-সমালোচক লিখেছেন—

> হয়তো সে সময়েই তিনি একটা বিশ্বাসের মূর্তি গড়তে ছেয়েছেন তাঁর নির্জনবাসে এবং শান্তি লাভ করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত (সুতরাং তাঁর ইচ্ছায় নয়)'রূপসী বাংলা'র কবিতাগুলো পড়লে মনে হয় 'বনলতা সেন'-এর দু-দণ্ড শান্তির বীজ 'রূপসী বাংলা'তেই ছিল, স্বপ্ন-বিশ্বাসের 'পরিমিত প্রসার ও গভীরতা' দিয়ে যে-বাংলা তৈরী।[৩]

ধূসর পাণ্ডুলিপি-র বহু ছত্রেই *রূপসী বাংলা*-র পূর্বাভাস মেলে। তবে *রূপসী বাংলা*-য় যে প্রশান্তি আছে সেই সিদ্ধি *ধূসর পাণ্ডুলিপি*-তে আয়ত্ত হয়নি। "অবসরের গান" কবিতায় প্রশান্তির সুর শোনা গেলেও তা শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হয়নি। প্রেম, প্রকৃতি, জীবন, মৃত্যু এবং সময়ের মাত্রাসমূহকে চেতনার আলোয় অনুসন্ধান চলেছে এই পর্বে। তাই অনিশ্চয়তা, বিক্ষোভ, ব্যাকুলতা অশান্ত করেছে কবিকে—"'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র জীবনানন্দ দাশ বাস্তব জীবনে বিশ্বাস হারিয়ে স্বপ্নের সত্যে বিশ্বাস স্থাপন করতে চেয়েছেন তখন"[৪]।

বাস্তব জীবন থেকে বিচ্যুতি আর বারংবার স্বপ্নভঙ্গের বেদনা তাঁকে ক্লান্ত করেছে। ''বোধ'', ''ক্যাম্পে'', ''বৈতরণী'', '১৩৩৩' প্রভৃতি কবিতায় এই ক্লান্তির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। *ধূসর পাণ্ডুলিপি*-তে যাবতীয় আনন্দ-উচ্ছ্বাস-আয়োজনের আয়ু একবার-একদিন-একরাত্রিতে সীমায়িত। "সহজ" কবিতায় এই ভাবটি ধরা পড়েছে—

> নিঃসঙ্গ বুকের গানে
> নিশীথের বাতাসের মত
> একদিন এসেছিলে,
> দিয়েছিলে একরাত্রি দিতে পারে যত![৫]

কিংবা "প্রেম" কবিতায়—

> একদিন—একরাত করেছি প্রেমের সাথে খেলা!
> একরাত—একদিন করেছি মৃত্যুরে অবহেলা!

একদিন—একরাত;--তারপর প্রেম গেছে চলে,- [...][৬]

কিন্তু *রূপসী বাংলা*-র প্রথম সনেটে কবি চিরকালের গল্প শোনান—

চারিদিকে শান্তবাতি--ভিজে গন্ধ--মৃদু কলরব,
খেয়ানৌকাগুলো এসে লেগেছে চরের খুব কাছে;
পৃথিবীর এইসব গল্প বেঁচে র'বে চিরকাল;--[৭]

বোঝা যায়, মানুষ নয়, প্রকৃতির সঙ্গে সংহতি রচনা করছেন কবি। একদিন আর এই কাব্যে সমাপ্তিসূচক নয়, বরং তা নূতনতর কোনো পর্বান্তর জানান দেয় **১৩** সংখ্যক সনেটে—"ঘুমায়ে পড়িব আমি একদিন তোমাদের নক্ষত্রের রাতে"[৮]। এই ঘুম মৃত্যুর প্রতীক হলেও তা বিচ্ছেদ আনে না, বরং প্রকৃতির সঙ্গে কবির হৃদয় আরো সহজ সম্পৃক্ত হয়ে ওঠে। প্রাণের প্রত্যেক পরমাণুকে কবি মৃত্যুস্নাত হয়ে দেখেছেন। মরণের ঘোর না থাকলে হয়তো রোদ আর মেঘের ঘনত্বে লীন, শালিখ-খঞ্জনার ডানায় দূর প্রসারিত অনন্ত জীবনকে আস্বাদ করা যায়না।

রূপসী বাংলা-র কবিতায় যে আরাম, যে স্নিগ্ধতা আছে তা কবিকে *বনলতা সেন*-এর বিপুল বিস্তৃতি, গতি ও ঔজ্জ্বল্যের দিকে পৌঁছে দিয়েছে। *ধূসর পাণ্ডুলিপি-র* ধূসর স্বপ্নের অনিশ্চয়তা থেকে উঠে এসে কবি *বনলতা সেন* এর "সুচেতনা" কবিতায় দেখেছেন—"শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়"[৯]। বা "মিতভাষণ" কবিতায়—

তবুও নদীর মানে স্নিগ্ধ শুশ্রূষার জল, সূর্য মানে আলো
এখনো নারীর মানে তুমি, কত রাধিকা ফুরালো[১০] ।

আর *রূপসী বাংলা*-য় কবি মৃত্যুর শোকগাথা রচনা করেও মৃত্যুকে ডিঙিয়ে যান। পৃথিবী নিংড়ে যাকে পাওয়া যায় না, নিজের একান্ত সান্নিধ্যে তার অস্তিত্ব অনুভব করেন কবি। ২৫ সংখ্যক সনেটে—"জানি সে আমার কাছে আছে আজো—আজো সে আমার কাছে আছে"[১১]।

জীবনানন্দের কবিজীবনে *রূপসী বাংলা*-র স্থানটি কবির বক্তব্যেরই সাহায্য বুঝে নিতে হয়—

> কোনো কিছুকে 'চরম' মনে করে সুস্থিরতা লাভ করার চেষ্টায় আত্মতৃপ্তি নেই; রয়েছে বিশুদ্ধ জগৎ সৃষ্টি করার প্রয়াস—যাকে কবিজগৎ বলা যেতে পারে—নিজের শুদ্ধ নিঃশ্রেয়স মুকুরের ভিতর বাস্তবে যা ফলিয়ে দেখাতে চায়। এতে করে বাস্তব বাস্তবই থেকে যায় না; দুয়ের একটা সমন্বয়ে সেতুলোক তৈরি হয়ে চলতে থাকে এক যুগ থেকে অপর যুগে—কোনো পরিনির্বাণের দিকে, কারু মতে; অল্পাধিক শুভ পরিচ্ছন্ন সমাজপ্রয়ানের দিকে, অন্য কারু ধারণায়; কবিজগতে যে পাঠকেরা ভ্রমণ করেছেন তাঁদের মনে (কিংবা হাতে) ইহজগৎ আবার নতুন করে পরিকল্পিত হবার সুযোগ পায় তাই।[১২]

রূপসী বাংলা-য় প্রকৃতি সম্পৃক্ততায় এই চরম বা পরমের বোধ আছে। কিন্তু কবির কাছে এই চরম বা পরমই অন্বিষ্ট নয়। তাই আত্মতৃপ্তিও ঘটেনা। নীল শুপুরির বন, পাড়াগাঁর দ্বিপ্রহর, ধানসিঁড়িটির তীরেই

যাত্রা শেষ হয় না—এতো হাজার বছর ধরে পৃথিবীর পথে হাঁটার উপক্রম মাত্র। *ধূসর পাণ্ডুলিপি*-তে যে হৃদয় মানুষ-মানুষী-শিশুর মুখ দেখেই তৃপ্ত ছিল, *রূপসী বাংলা*-য় সেই হৃদয় জন্মভূমির ভূগোল-ইতিহাস-জীব বৈচিত্র্যকে বুকে নিয়ে অর্ধনারীশ্বর হতে চায়। আবার *বনলতা সেন*-এ এসে সেই হৃদয়ই পৃথিবী ছিঁড়ে তারায় তারায় উড়ে যেতে চায়।*ধূসর পাণ্ডুলিপি*-তে কবি উৎকণ্ঠিত, *রূপসী বাংলা*-য় তিনি ইতিহাসযানে সওয়ার,*বনলতা সেন* যেন আর এক বলাকা। তাই জলা মাঠ ছাড়িয়ে পেঁচা সাড়া দেয় চাঁদের আহ্বানে।

আরো একদিক থেকে*রূপসী বাংলা* অনন্য। তা হ'ল এর চূড়ান্ত মন্ময়তা। কবিতা থেকে কবিতায় পৌনঃপুনিকভাবে ফিরে আসে হিজল, শটিবন, ফণিমনসার ঝোপ, ভাঁটফুল, রূপশালী ধান, কলমীর ঘ্রাণ, শেফালী, শ্যামা, খঞ্জনা, শালিখ, লক্ষ্মীপেঁচা, মাছরাঙা, সুদর্শন, ধানসিঁড়ি, হলুদ শাড়ী, বিশালাক্ষ্মী, বেহুলা, ধলেশ্বরী, মধুকর ডিঙা এবং আমি—উত্তমপুরুষ। প্রত্যেকটি সনেটের মধ্যেই রূপ ও ভাবের সংগতি বর্তমান। বিপুলা পৃথিবী তার যাবতীয় অঙ্গরাগ নিয়ে সম্মিলিতভাবে এক অদ্বিতীয় কথাশরীর রচনা করেছে। এ প্রসঙ্গে*রূপসী বাংলা* কাব্যের "ভূমিকা"য় কবিভ্রাতা অশোকানন্দ দাশের উক্তি স্মরণ করা যায়--"কবির কাছে 'এরা' প্রত্যেকে আলাদা-আলাদা স্বতন্ত্র সত্তার মতো নয় কেউ, অপরপক্ষে সার্বিক বোধে একশরীরী; গ্রামবাংলার আলুলায়িত প্রতিবেশ-প্রসৃতির মতো ব্যষ্টিগত হয়েও পরিপূরকের মতো পরস্পর নির্ভর"[১৩]।

এ কাব্যের প্রতিটি কবিতায় কবি গ্রামবাংলার প্রকৃতির রূপমাধুরীর সঙ্গে ইন্দ্রিয়সম্বন্ধে লীন হয়ে আছেন। কবির জীবন ও মৃত্যু নিটোলভাবে বাংলার রূপে মিশে গিয়ে সমসত্ত্ব কাব্যদ্রবণ রচনা করেছে। এ কাব্যের পাঠ নিতে যাওয়ার অর্থ হ'ল ব্যক্তি কবির আত্মজীবনী পাঠ। তাই কি কবি একে অপ্রকাশের আড়ালে রাখতে চেয়েছিলেন? সে উত্তর পাওয়া না গেলেও কবিতার সৃজন সম্পর্কে কবির নিজের বক্তব্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ—

> আমরাও দেখছি—এবং এই আশ্চর্য চলৎপ্রতিভাময়ী পটভূমির সঙ্গে একাত্ম হয়ে রয়েছে আধুনিক কবিমন; সেই মনের থেকে উত্তীর্ণ ছন্দের দ্যোতনায় যা সৃষ্টি হয় তা-ই কবিতা। যে কোনো সময়ের যে কোনো জগতের সত্য অভিজ্ঞতা কোনো এক বিশেষ আধারে অন্তঃপ্রবেশ লাভ করে যখন চিত্রস্তনিত ধ্বনির পবিত্র মর্মস্পর্শিতায় ফুটে উঠতে থাকে, তখন বুঝতে হবে যে, সে আধার সক্রিয় কবিমন—কবিতা সৃষ্টি হচ্ছে।[১৪]

এই বিশ্লেষণেরই সার্থক সংশ্লেষনাত্মক পরিণাম *রূপসী বাংলা*। "পটভূমির সঙ্গে একাত্ম" হওয়া বলতে যা বোঝায় তা *ধূসর পাণ্ডুলিপি*-তে অনুপস্থিত। আর *বনলতা সেন*–এ কবি যে চলন্ত নির্মাণ রচনা করেন তা আর মন্ময় থাকে না, বিশ্বজনীন হয়ে ওঠে। এই পর্বের পাঠক মহেশ্বরের মতো কবির উদ্দেশেও বলতেই পারেন—

> পঞ্চশরে দগ্ধ করি করেছ এ কী সন্ন্যাসী,
> বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে।

ব্যাকুলতর বেদনা তার বাতাসে উঠে নিশ্বাসি
অশ্রু তার আকাশে পড়ে গড়ায়ে।[১৫]

কারণ, "হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে" এই বয়ান যখন পাঠকের কাছে পৌঁছে যায়, তখন আর তা' কোনো একক প্রেমিকের আর্তি থাকে না। হাজার বছর ধরে পৃথিবী জুড়ে প্রেয়সীর মুখ খুঁজে চলা সকল যুগের প্রেমিকের আত্মকথন হয়ে ওঠে। তাই এই "আমি" মন্ময় নয়। অন্যদিকে, "বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি তাই পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর" এখানে "আমি" এক আত্মসমাহিত কবিপ্রাণ, যার সঙ্গে প্রকৃতির সম্পৃক্তি ঘটে গেছে। উপনিষদের "আত্মানং বিদ্ধি"—নিজেকে জানার জন্য দূরে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। তাই *রূপসী বাংলা* এত প্রত্যক্ষ, এত নিশ্চিত, এত গাঢ় সন্নিহিত। "বনলতা সেন", "সুচেতনা" বা "সুরঞ্জনা" রা উজ্জ্বলতর, শ্রেয়োতর হয়েও শাশ্বতী নয়।

জীবনানন্দের কবিতার পরতে পরতে জড়িয়ে থাকে মৃত্যু। কোথাও শরীরী মৃত্যু, কোথাও উর্বরতার মৃত্যু, কোথাও বা বন্ধ্যা যুগ। আবার কোথাও মৃত্যুর নাট্যমুহূর্ত তৈরি হয়। *রূপসী বাংলা*-র প্রায় প্রত্যেক কবিতায় মৃত্যুর নীল ছায়া। কিন্তু সেই মৃত্যু নৈরাশ্য, অপূর্ণতা বা বেদনায় ম্লান নয়। আধুনিক কবির পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞানের অন্যতম শর্তই হ'ল মৃত্যুকে জানা। না হলে জীবনের অর্ধেকমাত্র জানা হয়। তবে কবিতা কোনো তত্ত্ব নয়। তাই সৃষ্টিশীল কবিচৈতন্য মৃত্যুর গহনে ডুব দিয়ে মৃত্যুকে নয়, অবলোকন করতে চায় জীবনকেই। *রূপসী বাংলা*-র মৃত্যুচেতনার মূল সুরটি কোনোভাবেই বৈনাশিক নয়।

ধসর পাণ্ডুলিপি-তেই কবি জীবনের পারে দাঁড়িয়ে অপরপারের মৃত্যুর মানচিত্র পড়তে চান। একদিকে আকাশের গাঢ় নীল আলো, অন্যদিকে নক্ষত্রের অন্ধকার যুগপৎ আকর্ষণ করে তাঁকে। আলো-অন্ধকার, জীবন-মৃত্যুর এই দ্বন্দ্বে অধীর অস্থির কবি কখনো ঝুঁকে পড়েন জীবনের দিকে। যেমন "অনেক আকাশ" কবিতায়—

সমুদ্রের অন্ধকারে ঘুম থেকে উঠে
দেখিবে জীবন তার খুলে গেছে পাখির ডিমের মত ফুটে[১৬]

সমুদ্রের অতলান্ত অন্ধকার আর বিহঙ্গের অস্থির জীবনবাসনার দ্বন্দ্বে প্রকৃতি যেন জীবনকেই জিতিয়ে দিতে চায়। কখনো মৃত্যুর কানে কানে জীবন ডাকতে আসে। শবাধার ছেড়ে তাঁর আত্মা ধাবিত হয় পৃথিবীর অভিমুখে। কখনো আবার জীবনের গোলকধাঁধায় ঘুরে মরা অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষারা স্বপ্নপ্রয়াণ ঘটায়। যেহেতু মানুষ থেকে নক্ষত্র সকলেরই আয়ু সীমিত, তাই স্বপ্নের শরণাপন্ন হতে হয়। অর্থাৎ জীবন ও মৃত্যুর ভেদরেখা এখানে স্পষ্ট। ধীরে ধীরে মৃত্যুকে চিনে নিচ্ছেন তিনি, তাই কখনো সংশয়, কখনো দ্বন্দ্ব। কখনো প্রশ্নাতুর তিনি। *রূপসী বাংলা*-র "আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে—এই বাংলায়"—এই মৃত্যু উত্তীর্ণ জীবন প্রত্যয় *ধূসর পাণ্ডুলিপি*-র "পিপাসার গান" কবিতায় সংশয়াকীর্ণ—

কোনো এক অন্ধকারে আমি
যখন যাইব চ'লে—আরবার আসিব কি নামি
অনেক পিপাসা লয়ে এ-মাটির তীরে

তোমাদের ভিড়ে![১৭]

প্রণয়িনীর খোঁপার জটাজাল আর শরীরের জরা মিথ্যা করে দেয় সৌন্দর্যের আয়োজন। কবিতা থেকে কবিতায় মৃত্যুর বলয়ে বন্দী কবি চিরত্বের ঠিকানা খুঁজে চলেন যেন। তাই "ক্যাম্পে" কবিতায় দেখি—

প্রেমের সাহস- সাধ- স্বপ্ন লয়ে বেঁচে থেকে ব্যাথা পাই পাই ঘৃণা-মৃত্যু পাই,
পাই না কি?[১৮]

রূপসী বাংলা-য় এসে মৃত্যুর সঙ্গে কবিজীবনের সখ্য স্থাপিত হ'ল। শরীর ভস্মভূত হয়। আর সেই মৃত্যুর দেউলে ভস্মাবশেষের উপরেই ঘাসের গুচ্ছ-বঁইচি-শেয়ালকাঁটা অপরাজেয় জীবনের দূত হয়ে আসে বিনা ভূমিকায়। মৃত্যুর উপরে ছায়া পড়ে জীবনের। ভ্রমরের ডানার গুঞ্জন এই বার্তাই জানান দেয় যে মৃত্যু আসলে refreshing. *রূপসী বাংলা*-র মৃত্যুচেতনা অত্যন্ত তাৎপর্যবাহী। কারণ তা জীবনের এক নিত্যতা সূত্রকে সিদ্ধ করেছে প্রতিনিয়ত। ২৭ সংখ্যক সনেটে এই ভাবটি স্পষ্ট—

হৃদয়ে জলের গন্ধ কন্যার—ঘুম নাই, নাইকো মরণ
তার আর কোনোদিন—পালঙ্কে সে শোয় নাকো, হয় নাকো ম্লান,
লক্ষ্মীপেঁচা, শ্যামা আর শালিখের গানে তার জাগিতেছে প্রাণ—
সারাদিন—সারারাত বুকে ক'রে আছে তার শুপুরির বন;[১৯]

এই নিত্যতার বোধ থেকেই চুঁইয়ে এসেছে জন্মান্তরের বিশ্বাস। এক জন্মে সাধ মেটে না কবির। পুনর্জন্মের আকাঙ্ক্ষা এই কাব্যের মৃত্যুচেতনায় ভিন্নতর মাত্রা সংযোজন করেছে। যে প্রেয়সীর রূপ জন্মে জন্মে যন্ত্রণা দেয় তারই আকর্ষণে জন্মান্তর পরম রমণীয় হয়ে ওঠে। কখনো আবার পূর্বজন্মের সুখস্মৃতি পাথেয় হয়ে ওঠে বর্তমানের। ১২ সংখ্যক সনেটে পাই—

[এ] জনমে নয় যেন—এই পাড়াগাঁর
পথে তবু তিন শো বছর আগে হয়তো বা—আমি তার সাথে
কাটায়েছি;--পাঁচ শো বছর আগে হয়তো বা—[...][২০]

এই পর্বে কবি নিশ্চিত যে মৃত্যুর হাত ছুঁয়ে পরজন্মে এই নবান্নের দেশেই ফিরে আসতে হবে তাঁকে। কিশোরীর হাঁস বা ভোরের কাকের জীবন ও লোভনীয় তাঁর কাছে।

রূপসী বাংলা-র মগ্ন আসঙ্গ থেকে কবি উঠে আসেন *বনলতা সেন*-এ। এই কাব্য পাড়ি দেওয়ার কাব্য। গতিময়তা এত বেশি এখানে যে মৃত্যু বা জীবন কোথাও কবি দু-দন্ডের বেশি থেমে থাকতে পারেন না। *রূপসী বাংলা*-য় কবিচেতনায় সময়ের যে সীমামুক্তি ঘটে যায় তা-ই *বনলতা সেন*-এ তাঁকে জঙ্গমতা দেয়। যেমন "বুনো হাঁস" কবিতায়—

কল্পনার হাঁস সব—পৃথিবীর সব ধ্বনি সব রঙ মুছে গেলে পর
উড়ুক উড়ুক তারা হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর।[২১]

আবার "বেড়াল" কবিতায় মাছের কাঁটায় লেগে থাকা জীবন বা মাটির নিচের মৃত্যুর মগ্নতা সেই গতিকে রুদ্ধ করতে পারে না। যে সূর্যের অনুগামী সেই তো অন্ধকারকে অনায়াসে লুফে নিতে পারে। মৃত্যু আর ব্যর্থতার খণ্ড বনহংস তার পাখার উল্লাসে ঝেড়ে ফেলে আকাশের রূপালি শস্যক্ষেতে উড়ে যায়। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায় আধুনিক কবিতার কোনো কোনো সমালোচক *বনলতা সেন*–এর কবিতাগুলিতে futurist গতিবাদের প্রভাব লক্ষ্য করেছেন।[২২]

রূপসী বাংলা-য় এসে মৃত্যুর সঙ্গে জীবনের যে হাত ধরাধরি হয়, তার রেশ থেকে যায় *বনলতা সেন*–এও। যেমন "অন্ধকার" কবিতায়—

> অন্ধকারের স্তনের ভিতর যোনির ভিতর অনন্ত মৃত্যুর মতো
> মিশে থাকতে চেয়েছি।[২৩]

এখানে স্তন আর যোনি শুধু যৌনতার প্রতীক নয়, তা জীবনেরও প্রতীক। যোনি জন্মের উৎস-অন্ধকার আর স্তন জীবধাত্রী—উর্বরতার চিহ্ন এসব। জন্মের অন্ধকারে অনন্ত মৃত্যুর অন্ধকার মিশে যায়। সূর্যের নির্দেশ অমান্য করে কবি হৃদয়ের স্বরচিত অবিরাম অবিরল অন্ধকারকে প্রশ্রয় দিতে পারেন। এ অন্ধকার আলোর অধিক স্বচ্ছ, নিশ্চিত তাঁর কাছে। সেদিক থেকে কবিতাটি *রূপসী বাংলা*-র মৃত্যুচেতনার সার্থক উত্তরাধিকার বহন করছে।

এ মহাবিশ্বের চালক হ'ল সময়। জ্যোতির্বিজ্ঞান থেকে নৃতত্ত্ব, দর্শন থেকে জীববিদ্যা, ইতিহাস থেকে কাব্য সর্বত্রই সময়ের ইশারায় চলে অনুসন্ধান। তার অজস্র পরস্পর বিরোধী প্যাটার্ন মানুষকে বিস্মিত করে। বিভ্রান্তও করে বহুক্ষেত্রে। সময়ের গতি কখনো রৈখিক, কখনো বা চক্রবৎ। কখনো তা দণ্ডপলে পরিমিত, কখনো আবার পৌনঃপুনিক। সময় চালিত হয়েও মানুষ আজীবন প্রতিস্পর্ধা রাখে সময়ের ডানায় সওয়ার হওয়ার। বিগত আর আগামীকে তালুবন্দী করার ইচ্ছাই তাকে সিসৃক্ষু করে। জীবনানন্দের কবিতায় সময়ের মাত্রাকে এই আকাঙ্ক্ষার ফলশ্রুতি রূপেই দেখা যায়। *ধূসর পাণ্ডুলিপি*-তে কবির সময়চেতনা সীমাবদ্ধ, কুয়াশাচ্ছন্ন। *রূপসী বাংলা*-য় কবি পোষ মানিয়েছেন সময়কে। সময় তাঁর ইচ্ছাধীন এখানে। অতীত থেকে ভবিষ্যতে, এমনকি জন্মের বেড়া ডিঙিয়েও অনায়াস, স্বচ্ছন্দ বিহার করেছেন তিনি। আর *বনলতা সেন*–এ তিনি সেই উড়ন্ত সময়ের ছবি আঁকেন যেন। কবির বয়ান এই মতকেই প্রতিষ্ঠা দেয়—

> "মহাবিশ্বলোকের ইশারার থেকে উৎসারিত সময়চেতনা আমার কাব্যে একটি সঙ্গতিসাধক অপরিহার্য সত্যের মতো; কবিতা লিখবার পথে কিছুদূর অগ্রসর হয়েই এ আমি বুঝেছি, গ্রহণ করেছি। এর থেকে বিচ্যুতির কোনো মানে নেই আমার কাছে। তবে সময়চেতনার নতুন মূল্য আবিষ্কৃত হতে পারে"।[২৪]

নিরবধি কালের খণ্ড অনুষঙ্গই *ধূসর পাণ্ডুলিপি*-তে বারংবার ফিরে আসে। জীবন অবাধ, অগাধ হ'লেও সময়ের নিজস্ব ভূগোল অতিক্রম করা যায় না। "মাঠের গল্প" কবিতায় সময় গড়িয়ে যাওয়া বয়স মাত্র—

আমি তারে বলি:
'ফসল গিয়েছে ঢের ফলি,
শস্য গিয়েছে ঝ'রে কত।—
বুড়ো হয়ে গেছ তুমি এই বুড়ী পৃথিবীর মত![২৫]

সময়ের বিভাজন নীতি কখনো নিপুন ছুরির মতো আনন্দ কেটে বিচ্ছেদ রচনা করে। কখনো চাঁপাফুলের শরীর থেকে ছিনিয়ে নেয় সৌরভ। যৌবন, সৌন্দর্য সকলি তার তীক্ষ্ণ আঘাতে ছিঁড়ে যায়। চলে যেতে হবে একদিন এই বোধের ছায়া ঘনায় জীবনের যাবতীয় আয়োজন আর সৃষ্টির উল্লাসের উপর। প্রেম মৃত্যুঞ্জয়ী। তাই অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতের আয়ু শেষ হলে মৃত্যুর গা বাঁচিয়ে তাকেও বিদায় নিতে হয়। জীবন এবং মৃত্যু পরস্পরের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয় সময়। কবিতাও তাই হয়ে ওঠে দ্বন্দ্বমুখর। মাটির ছোঁয়াচ, উর্বরতার স্বাদ, শরীর আর প্রাণের আহ্লাদে ভরে যায় হৃদয়। কিন্তু পরক্ষণেই অসুখ, বিনাশ আর পচন মানুষ-মানুষী-শিশুর মুখ ঢেকে দেয়। সময়ের হাতে আক্রান্ত হয় নিশ্চয়তা।

তথাপি এক অনুসন্ধান জারি থকে নিরন্তর। স্বপ্ন আর আকাঙ্ক্ষার যাদুমন্ত্রে সময়ের সমান্তরাল হয়ে উঠতে চান কবি। *ধূসর পাণ্ডুলিপি*-র "স্বপ্নের হাতে" কবিতায় এই প্রতিস্পর্ধার ভাবটি আভাসিত—

সব ছেড়ে আমাদের মন
ধরা দিত যদি এই স্বপনের হাতে!
পৃথিবীর রাত আর দিনের আঘাতে
বেদনা পেত না তবে কেউ আর,--
থাকিত না হৃদয়ের জরা।--
সবাই স্বপ্নের হাতে দিত যদি ধরা![২৬]

এভাবে জন্ম-মৃত্যু-দিন-রাত্রি আলো-অন্ধকার পেরিয়ে সময়ের পথে পাথেয় হয় আকাঙ্ক্ষা।
কিন্তু *রূপসী বাংলা*-য় সময়ের শরীর তৈরি হয় ইতিহাস- প্রকৃতি- পুরাকথার নিখুঁত সমন্বয়ে। ফনীমনসার ঝোপ থেকে মনসামঙ্গলের পুরাণকথায় সময়ের বিস্ময়কর উল্লম্ফন ঘটে। যাত্রা, পাঁচালী, কীর্তন, ভাসান আর রূপকথার ঐতিহ্যে এক বিলম্বিত লয়ের প্রশান্তি আছে। অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ আর সময়ের খাঁচায় বন্দী নয়, কবির "কল্পনাপ্রতিভা" তাদের মুক্তি দিয়েছে। তাই বনের হীরামন হয়ে কবি সোনার খাঁচা খুলে ফেলেন, গান আর গল্পের কথকতা হয়ে ওঠে *রূপসী বাংলা* । রূপকথা থেকে উঠে এসে কেশবতী কন্যা বাংলার নীল সন্ধ্যার বুকে মেলে দেয় তার অনন্য অলকদাম। বাংলার পথের ধুলোয় বেহুলা-লহনার পদচিহ্ন আজো মুছে যায়না। সনকার অশ্রুজলে এখনো ভিজে থাকে খড়। ভাসান আর মাথুরের করুণ সুরে একাকার হয়ে থাকে শত শতাব্দী। রোদ-বৃষ্টি তাই সহজ ভালোলাগার বিষয়। জীবনের যাবতীয় অসূয়া মুছে দেয় প্রকৃতি রূপসী। ৪৭ সংখ্যক সনেটে—

[...] কোন্ এক রহস্যের কুয়াশার থেকে
যেখানে জন্মে না কেউ, যেখানে মরে না কেউ, সেই কুহকের থেকে এসে
রাঙা রোদ, শালিধান, ঘাস, কাশ, মরালেরা বার বার রাখিতেছে ঢেকে

আমাদের রুক্ষ প্রশ্ন, ক্লান্ত, ক্ষুধা, স্ফুটমৃত্যু—[২৭]

ক্ষনিকের রোমাঞ্চ অন্তহীন অরুণে অবগাহন করে প্রসারতা পায়। কখনো কবির চিতার ছাইয়ের উপর গুচ্ছ-গুচ্ছ ঘাস জন্মায় আবার কখনো সবুজ ঘাসের বুক থেকে শরীর খুঁজে পান তিনি। এর মধ্যে শোক বা শঙ্কা নেই। সময়ের গতিপথ *রূপসী বাংলা*-র কবির চেনা হয়ে গেছে।

সময় মৃত্যুকে কবির শরীর ভিক্ষা নিতে পাঠায়। কিন্তু যে প্রাণ রামপ্রসাদের শ্যামা, চাঁদ সদাগরের মধুকর ডিঙা আর বেহুলা-লহনার মধুর জগতে লীন তাকে তো বিচ্যুত করা যায় না। *রূপসী বাংলা*-য় মৃত্যু উজাগর, কিন্তু রূপ অশেষ। সময়ের হাত ধরে কবি ইতিহাসযাপনে বেরিয়েছেন। পাঁচ শো কিংবা সাত শো বছর তাঁর কাছে শতাব্দীর বারান্দায় পদচারণা মাত্র। সময়ের সঙ্গে লগ্ন হয়ে থাকার স্বীকৃতি মেলে পরজন্মে। এ প্রসঙ্গে উমার জন্মের পুরাকথার প্রয়োগ লক্ষণীয়। চন্দ্রশেখরের মত কবি যেন তাঁর শাশ্বতী বোধের পুরস্কার লাভ করেন অকপট উমার প্রেমের গল্পে। মৃত্যুকে তিনি আলিঙ্গন করেছিলেন প্রেমে— তাই সময়ের গর্ভ থেকে তুলে এনেছেন পুনরাগমন আর পুনর্জন্ম। ২১ সংখ্যক সনেটে—

সতীর শীতল শব বহুদিন কোলে লয়ে যেন অকপট
উমার প্রেমের গল্প পেয়েছে সে,--চন্দ্রশেখরের মতো তার জট
উজ্জ্বল হতেছে তাই সপ্তমীর চাঁদে আজ পুনরাগমনে[২৮]

শত শতাব্দীর বটের মতোই প্রাচীন আর অমরতাময় আকাঙ্ক্ষার কাছে নতজানু হয় সময়।

বনলতা সেন-এ কবির চোখে যেন পাখির দৃষ্টি। *রূপসী বাংলা*-র ক্লান্তিহীন সফর এ কাব্যে অবিরাম উড়ানে পরিণত। "অঘ্রাণ প্রান্তরে" কবিতায়—

আমাদের জীবনের অনেক অতীত ব্যাপ্তি আজো যেন
লেগে আছে বহতা পাখায়
ঐ সব পাখিদের;...[২৯]

ধূসর পাণ্ডুলিপি-তে কবি জীবনের অনিশ্চয়তা ভুলতে স্বপ্নের কাছে আশ্রয় খুঁজেছিলেন। *রূপসী বাংলা*-য় তিনি আকাঙ্ক্ষার শরীর থেকে মুছে ফেলেন আয়ুর পরিসীমা। আর *বনলতা সেন*-এ তিনি জানেন মানুষ স্থবির হলেও সময়ের স্রোতে তাকে নিশ্চিত ভেসে যেতেই হবে। তাই *বনলতা সেন* একাধারে সময়ের চলন্ত নির্মাণ আর কবির নির্মোহ নিজস্বী। অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতে স্বচ্ছন্দ চলাচল করেন তিনি। কিন্তু খসিয়ে ফেলেছেন স্মৃতির ভার। যেমন "কুড়ি বছর পরে" কবিতায় —

কুড়ি বছরের পরে তখন তোমারে নাই মনে!
জীবন গিয়েছে চলে আমাদের কুড়ি কুড়ি বছরের পার—[৩০]

প্রেম-আশা-চেতনার অনু-পরমাণু সময়ের শরীরে চোরকাঁটার মতো লেগে থাকে। স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা-কর্তৃত্ব পার হয়ে নীরব নির্লিপ্তিই মোক্ষ। আর তাকে স্বাগত জানাতে হয় হাজার বছরের পরিক্রমায়। মৃত

নক্ষত্রকে ছেড়ে তার আলো হাজার বছরের পথ পাড়ি দিয়ে আসে কবির জানলায়। প্রেম-অপ্রেম থেকে দূরে সরে এসেই সম্ভব হয় সময়ের প্রকৃতিস্থ উদ্ভাবন। এই হল *বনলতা সেন*-এর সময়চেতনা।

*মহাপৃথিবী*র সময়চেতনা প্রাক ইতিহাসের প্রকৃতি নির্ভরতা থেকে ছিঁড়ে বহুদূর পাড়ি দেয়। "আদিম দেবতারা" কবিতায়—

> আগুন বাতাস জলঃ আদিম দেবতারা তাদের সর্পিল পরিহাসে
> তোমাকে দিলো রূপ—
> ...
> আগুন বাতাস জলঃ আদিম দেবতারা তাদের বঙ্কিম পরিহাসে
> রূপের বীজ ছড়িয়ে চলে পৃথিবীতে,[৩১]

প্রকৃতির মৌলিক উপাদান জুড়ে জুড়েই সৃষ্টির নির্ভুল রূপ নির্মাণ হয়। আর সেই রূপের বীজ সংক্রামিত হয় সর্বত্র। কিন্তু মানুষের বৈনাশিক প্রতিভা মারাত্মক। যেখানেই তার স্থূল হস্তাবলেপ পড়ে সেখানে শুধুই অপচয়। আগুন বাতাস জল আর শূকরের মধ্যে প্রকৃতি বৈষম্য করেনি। অথচ মানুষের হননেচ্ছা তাকে প্রকৃতির প্রভু করে তোলে—পরিবেশ তার কাছে ব্যবহারের সামগ্রী ছাড়া অন্য কিছু নয়—

> পৃথিবীর সমস্ত রূপ তার কাছে অমেয় তিমির মৃতদেহের দুর্গন্ধের মতো,
> যেখানেই যাই আমি সব সমুদ্রের উল্কায়-উল্কায়
> কেমন স্বাভাবিক, কী স্বাভাবিক![৩২]

"প্রার্থনা" কবিতায় প্রভুত্বের মোহে অন্ধ মানুষের চক্ষে দৃষ্টি প্রার্থনা করেন। প্রকৃতি পাহাড় দেয়। মানুষ প্রতিযোগিতা করতে পিরামিড বানায়। ডিনামাইটের সাহায্যে পাহাড়ের বুক বিদীর্ণ করে হরণ করে প্রকৃতির স্বাভাবিক ঐশ্বর্য—

> ডিনামাইট দিয়ে পর্বত কাটা না-হলে কী ক'রে চলে,--[৩৩]

প্রকৃতিকে ধ্বংস করে, অরণ্য মুছে দিয়ে মানুষ ইস্পাতনগরী নির্মাণ করে আর নিশ্চিন্তে নিদ্রা যায়। সেইসব মূঢ় মানুষের জন্য জীবনানন্দের কবিতা ভবিষ্যদ্বাণী হয়ে ওঠে। *মহাপৃথিবী*র "মনোবীজ" কবিতায়—

> জামিরের ঘন বন অইখানে রচেছিল কারা?
> এইখানে লাগে নাই মানুষের হাত।
> দিনের বেলায় যেই সমারূঢ় চিন্তার আঘাত
> ইস্পাতের আসা গড়ে—সেই সব সমুজ্জ্বল বিবরণ ছাড়া
> যেন আর নেই কিছু পৃথিবীতেঃ এই কথা ভেবে
> যাহারা রয়েছে ঘুমে তুলোর বালিশে মাথা গুঁজে;--
> তাহারা মৃত্যুর পর জামিরের বনে জ্যোৎস্না পাবে নাকো খুঁজে;

বধির ইস্পাত-খড়্গ তাহাদের কোলে তুলে নেবে।[৩৪]

জামিরের বন অথবা ইস্পাত গড়, জোৎস্না অথবা ইস্পাত-খড়্গ—প্রত্যেকের কাছেই বিকল্প থাকে। কিন্তু মানুষের উচ্চাশা তার যথাপ্রাপ্ত পরিবেশকে মুমূর্ষু করে তোলে। কিন্তু এই সুর *রূপসী* বাংলা-র সুর সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানে বিপন্নতা নেই, আছে প্রকৃতির অঙ্গে লীন হয়ে জীবন ও মৃত্যুর প্রশান্তি। ইস্পাত-খড়্গ নয়, প্রকৃতিই সস্নেহে কোল পেতে দেয়। মৃত্যু আসে প্রগাঢ় শান্তি নিয়ে—

আমার বুকের পরে—বঁইচি শেয়ালকাটা আমার এ দেহ ভালোবাসে,
নিবিড় হয়েছে তাই আমার চিতার ছাইয়ে—বাংলার ঘাসে
গভীর ঘাসে গুচ্ছে রয়েছি ঘুমায়ে আমি,--নক্ষত্র নড়িছে[৩৫]

সাতটি তারার তিমির কাব্যগ্রন্থের "রাত্রি" কবিতায় পরিবেশ দূষণের প্রত্যক্ষ দৃশ্য ধরা পড়ে—

একটি মোটরকার গাড়লের মতো গেল কেশে
অস্থির পেট্রল ঝেড়ে;[৩৬]

এতক্ষণ যেসব কোলাজ তুলে ধরা হ'ল তাতে যেমন *ধূসর পাণ্ডুলিপি* থেকে *রূপসী বাংলা* হয়ে *বনলতা সেন ও মহাপৃথিবী* পর্যন্ত যেমন পর্যন্ত বিবর্তনের ধারাপথটিকে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে তেমনি *রূপসী বাংলা-* র স্বভাবটিকে অপর দুই কাব্যের সঙ্গে তুলনামূলক প্রেক্ষিতে অনুধাবন করার অসম্পূর্ণ প্রচেষ্টা রয়েছে। জীবনানন্দের কবিতায় প্রেম ও নিসর্গের সন্নিকর্ষ অন্যত্রও আছে। কিন্তু *রূপসী বাংলা-* র মতো কোথাও এতখানি চিরপদার্থ নিয়ে ধরা দেয় নি। *ধূসর পাণ্ডুলিপি-*তে প্রকৃতির যে রূপ উঠে আসে, তা রূপসী নয়, সুশ্রী নয়। পৃথিবীর পথ পরিক্রমায় কবিকে ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে হয়। কালকের প্রিয়ার রক্তের ভালোবাসা আজ অন্য কারো পিপাসা চরিতার্থ করে। বনের বিস্ময়, চৈত্রের বাতাস, জ্যোৎস্নার শরীর, প্রেমের সময় থেকে যাদু মুহূর্ত খসে যায় বন্দুকের শব্দে। বনলতা সেনের কাছে প্রেমের ছাউনিতে তিনি শান্তি পান—কিন্তু তার স্থায়িত্ব মাত্র দু'দন্ডের, যে চোখের মধ্যে হাজার বছরের পথ হাঁটা শেষ হয়, তাও "পাখির নীড়ের মতো"—ক্ষণকালের। আর সব পাখি ঘরে ফিরলেও "সব নদী--" অংশের অসমাপ্ত বাক্যাংশ বলে দেয় নদীর মরুপথে হারিয়ে ফেলা ধারার ব্যথা। *মহাপৃথিবী* তে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সভ্যতার টানাপোড়েনটি প্রকট। "বেতের ফলের মতো নীলাভ ব্যথিত চোখ" আর "করুণ শঙ্খের মতো" স্তন নিয়ে যে নারী ডাক দেয় তাকেও কবি খুঁজে চলেন কুয়াশার পাখনায়, সন্ধ্যার নদীজলে, সোনার সিঁড়ির মতো ধানে। সেও ধরা দেয়, কিন্তু বারেকের জন্য। তাই বাতাসের ধূলো খড় থেকে চোখ সরিয়ে আরো হাজার বছর পথহাঁটায় মন দেন নিস্পৃহ কবি।

এক অশান্ত, পীড়িত, উৎকেন্দ্রিক কবিকল্পনা কখনো গাঢ়, কখনো অর্ধস্বচ্ছ বিষণ্ণতার মোড়কে উপস্থাপিত হয়। উড়ন্ত উদাসীনতায় কখনো সনাতন হতে চায় মন। পাশাপাশি, *রূপসী বাংলা-* র প্রায় প্রত্যেক কবিতাই প্রত্যক্ষ মৃত্যুচেতনায় জারিত। অথচ তা বেদনায় বিক্ষত নয়, বিস্ময়বোধে উদ্ভাসিত। "হৃদয়ে প্রেমের দিন" শেষ হ'লেও আকাশে প্রেমের শব্দ শোনা যায়। কবি-আত্মা এখানে নির্জন কিন্তু সৌম্য। ইতিহাস থেকে ঐতিহ্য, পুরাণ অনুষঙ্গ থেকে রূপকথা, কিংবদন্তি থেকে কাব্যস্মৃতি সর্বত্র জারি থাকে প্রেয়তর মুখশ্রীর অন্বেষণ। বহুমাত্রিক সুষমা নিয়ে প্রেম রূপসী বাংলার রন্ধ্রে রন্ধ্রে সাঙ্গীকৃত হয়। বাংলার

মুখ থেকে রূপসীর মুখ আর প্রেয়সীর মুখ আলাদা করা যায় না। মৃত্যুর সঙ্গে ঘনসম্বন্ধে মৃত্যুকে ছাপিয়ে যায় প্রেম। আর সমস্ত কবিতার ধ্রুবপদ হয়ে থাকে বাংলার প্রকৃতির মুখ।

রূপসী বাংলার পরিচিত ক্যানভাসখানি কখনো বিষণ্ণ মনোভঙ্গির বিচিত্র রঙ ও রেখার সংঘটন; কখনো এই বাংলার ভূমিসুতা রহস্যময়ী কুহকিনীর ইন্দ্রজাল বলিরেখার মত পার্থিব ক্লেশ মুছে দেয় নিজস্ব রূপটানে। পরিচিত ইন্দ্রিয় স্বাদের পরিসরে লগ্ন থাকতে চান কবি। এই প্রিয় থেকে প্রিয়তর অভিলাষের নাভি থেকে উঠে আসে অনিবার্য বিষণ্ণ দ্যুতি। একান্ত ঘনিষ্ঠ নিঃশ্বাস বিনিময়ের মধ্যেও প্রেমবৈচিত্ত্যের সুর গূঢ় হয়ে থাকে; থাকে মানবজন্মের নিশ্চিত মাথুর। ১২ সংখ্যক সনেটে দেখি—

> ধান কাটা হয়ে গেলে মাঠে মাঠে কত কুড়ালাম খড়,
> বাঁধিলাম ঘর এই শ্যামা আর খঞ্জনার দেশ ভালোবেসে।
> ভাসানের গান শুনে কতবার ঘর আর খড় গেল ভেসে
> মাথুরের পালা বেঁধে কত বার ফাঁকা হ'ল খড় আর ঘর।[৩৭]

এই বিষণ্ণতা ম্লান-মধুর। *ধূসর পাণ্ডুলিপি*-র মতো কর্কশতা নেই এখানে, নেই দ্বিমেরুবিষম বিপ্রতীপতা।

"পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমাহীন গাঢ় এক রূপসীর মুখ ভালোবেসে" যে ভুল করেছেন কবি, সেই ভ্রান্তির ধানসিঁড়ি বেয়ে জন্মে জন্মে কেবল ধারাবাহিক নিসর্গযাপন। বর্নচ্ছটা, বিচ্ছুরণ মুছে যায়। তবু সবুজ ঘাসের মধ্য দিয়ে গড়িয়ে চলে আশা-আকাঙ্ক্ষা-অপেক্ষা। ধরা দেয় সঞ্জীবনী। কখনো আতার ক্ষীর হয়ে, কখনো বৃষ্টির রূপালি জল হয়ে স্নিগ্ধ মমতামাখা প্রেম ঝরে। তার পশম কোমল বুকেই জন্ম-জন্মান্তরের আশ্রয় মেলে।

তথ্যসূত্র

১। দাশ, জীবনানন্দ। (১৩৭৭)। *জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ*। প্রথম প্রকাশ। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ১৮৬।

২। চক্রবর্তী, সন্তোষ। (মার্চ-এপ্রিল, ২০২০)। '"বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি: জীবনানন্দের কবিচেতনায় বাংলা।" সম্পা. তারাপদ ঘোষ, অজিত মণ্ডল। *পশ্চিমবঙ্গ: কবি জীবনানন্দ দাশ স্মরণসংখ্যা* (৩৩)। পৃ. ১২২।

৩। ভট্টাচার্য, সঞ্জয়। (১৯৭৪)। *কবি জীবনানন্দ দাশ*। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা: ভারবি, পৃ. ৪৯।

৪। তদেব, পৃ. ৪৮।

৫। দাশ, জীবনানন্দ। (১৩৭৭)। *জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ*। প্রথম প্রকাশ। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ৪৮।

৬। তদেব, পৃ. ১০৪।

৭। তদেব, পৃ. ১৮৯।

৮। তদেব, পৃ. ১৯৬।

৯। তদেব, পৃ. ৩৩।

১০। তদেব, পৃ. ৩২।

১১। তদেব, পৃ. ২০৩।

১২। দাশ, জীবনানন্দ। (১৩৮৭)। *কবিতার কথা*। চতুর্থ সংস্করণ। কলকাতা: সিগনেট প্রেস, পৃ.৪৪।

১৩। দাশ, জীবনানন্দ। (১৩৭৭)। *জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ*। প্রথম প্রকাশ। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ১৮৬।

১৪। দাশ, জীবনানন্দ। (১৩৮৭)। *কবিতার কথা*। চতুর্থ সংস্করণ। কলকাতা: সিগনেট প্রেস, পৃ. ৪৭।

১৫। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (১৯৮০)। *রবীন্দ্ররচনাবলী*। প্রথম প্রকাশ। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ৮০২।

১৬। দাশ, জীবনানন্দ। (১৩৭৭)। *জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ*। প্রথম প্রকাশ। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ৬২।

১৭। তদেব, পৃ. ১০৫।

১৮। তদেব, পৃ. ৮১।

১৯। তদেব, পৃ. ২০৪।

২০। তদেব, পৃ. ১৯৫।

২১। তদেব, পৃ. ১৫।

২২। ত্রিপাঠী, দীপ্তি। (২০০৭)। *আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়*। প্রথম দে'জ সংস্করণ। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ১৬৭।

২৩। তদেব, পৃ. ২২।

২৪। দাশ, জীবনানন্দ। (১৩৮৭)। *কবিতার কথা*। চতুর্থ সংস্করণ। কলকাতা: সিগনেট প্রেস, পৃ. ৪৩।

২৫। দাশ, জীবনানন্দ। (১৩৭৭)। *জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ*। প্রথম প্রকাশ। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ৪২।

২৬। তদেব, পৃ. ১১৪।

২৭। তদেব, পৃ. ২১৬।

২৮। তদেব, পৃ. ২০১।

২৯। তদেব, পৃ. ২৯।

৩০। তদেব, পৃ. ১০।

৩১। তদেব, পৃ. ১৪৯।

৩২। তদেব, পৃ. ১৪৮।

৩৩। তদেব, পৃ. ১৫২।

৩৪। তদেব, পৃ. ১৫৩-১৫৪।

৩৫। তদেব, পৃ. ১৯৬।

৩৬। দাশ, জীবনানন্দ। (১৩৭৮)। *জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ*। প্রথম প্রকাশ। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ১৮।

৩৭। দাশ, জীবনানন্দ। (১৩৭৭)। *জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ*। প্রথম প্রকাশ। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫।

গ্রন্থপঞ্জী

- চক্রবর্তী, সন্তোষ। (মার্চ-এপ্রিল, ২০২০)। "'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি: জীবনানন্দের কবিচেতনায় বাংলা।" সম্পা. তারাপদ ঘোষ, অজিত মণ্ডল। *পশ্চিমবঙ্গ: কবি জীবনানন্দ দাশ স্মরণসংখ্যা* (৩৩)। পৃ. ১২২।
- ত্রিপাঠী, দীপ্তি। (২০০৭)। *আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়*। প্রথম দে'জ সংস্করণ। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (১৯৮০)।*রবীন্দ্ররচনাবলী*। প্রথম প্রকাশ। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
- দাশ, জীবনানন্দ। (১৩৮৭)। *কবিতার কথা*। চতুর্থ সংস্করণ। কলকাতা: সিগনেট প্রেস।
- --- *জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ*। (১৩৭৭)। প্রথম প্রকাশ। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।
- --- *জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ*। (১৩৭৮)। প্রথম প্রকাশ। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ। (২০০৭)। *জীবনানন্দ দাশ বিকাশ প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত*। প্রথম দে'জ সংস্করণ। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।
- বসু, বুদ্ধদেব। (২০১২)। *প্রবন্ধ সংকলন*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।
- ভট্টাচার্য, সঞ্জয়। (১৯৭৪)। *কবি জীবনানন্দ দাশ*। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা: ভারবি।